?????????

নীল রঙের নোনা ধরা দেওয়ালে হলদে হয়ে যাওয়া টিউব বাতির নীচে টানানো ঘড়িতে বাজে বারোটা চল্লিশ। রাত বারোটা চল্লিশ। না, এবার একটু বিশ্রাম নিতে হবে। কাল খবরের কাগজের অফিসে ইন্টার্ভিউ।

সকাল সকাল উঠতে হবে। ছবিটা ইজেল থেকে নামিয়ে সুব্রত সেটা খোলা জানালার দিকে মুখ করে একটা বেতের চেয়ারে ঠেশ দিয়ে রাখল। তারপর তুলি, প্যালেট, রঙের শিশি, জলের বাটি, ন্যাকড়া সব ধুয়ে রেখে, সাবান দিয়ে হাত থেকে রঙ উঠিয়ে, দাঁত মেজে সুব্রত শুয়ে পড়ল।

নিভে গেল ঘরের বাতি। অন্য সব ঘরের মতো। পাশের ঘরে মা ঘুমচ্ছেন। অসুস্থ, দুর্বল। বাবা নেই। বছর দুয়েক হল চলে গেছেন হৃদরোগে। তারপর সংসারে বাবার জায়গাটা পূরণ করার চেষ্টায় সুব্রতর বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তার ইংরাজিতে স্নাতকোত্তরের পড়াশুনা সম্পূর্ণ করা। শেষ হয়ে গিয়েছিল স্বপ্ন দেখা।

একজন শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন। সামান্য কেরানির ঘরে তার জন্ম, সংসারে অভাব তার কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু যে মূল খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সামান্যতম সুখটুকু, আজ সে খুঁটি নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সময় এসেছে এবার, বাপের মুখাগ্নি করতে গিয়ে বুঝেছিল সেদিন সুব্রত।

আর কাল তার পরীক্ষা। চাকরির পরীক্ষা। সুব্রতর মন খারাপ হয় না এখন। প্রথম প্রথম হত। কান্না পেত। এখন আর পায় না। খালি যখন সারা দিন চাকরির সন্ধানে টোটো করে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে সুব্রত, তখন তার ছোট্ট ঘরে ছড়ানো ছেটানো তার হাতে আঁকা ছবিগুলর দিকে তাকালে সেগুলোর প্রতি খুব মায়া হয় তার। কি হবে আর ওগুলোর? হয়তো একদিন টাকার জন্য বেচে দিতে হবে সব। সঙ্গে আকার সরঞ্জামগুলোও।

নিজের অঙ্কন ক্ষমতার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে সুব্রতর। কিন্তু একজনের কাছে যা সুন্দর, তা তো আরেকজনের কাছে সুন্দর নাও হতে পারে। যা হোক, ওগুলোকে যে সুব্রতকে একদিন ফেলে দিতে হবে, সেটা সুব্রত জানত। এবং তার সাথে ফেলে দিতে হবে তার শিল্পী সত্ত্বাটাকেও। তাই মায়া হয় তার সন্তানদের উপর সুব্রতর আজকাল। দুঃখ হয় না।

কিন্তু এই ছবিটা এঁকে সেটাকে দেখে কিন্তু সুব্রতর মায়া হওয়ার চেয়েও লোভ হয়েছিল অনেক বেশি। লোভ হয়েছিল ছবির বিষয়বস্তুর উপরে। এবং সেই লোভ থেকেই সুব্রত সেই রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বার কিছু আগে আবার মনে মনে ভেবেছিল, 'ঈশ, সত্যি যদি এরকমটা হত...'।

****

‘সুব্রত বোস।’

‘সুব্রত… সুব্রত, সুব্রত… পদবি কি বললেন? বোস?’

‘হ্যাঁ, প্লিজ একটু দেখুন, কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে।’

‘সুব্রত,… সুব্র-… সুব্রত দত্ত আছেন একজন… আর… আর তো… উঁহু, আর তো কোন সুব্রত নেই।’

‘মানে?’

‘মানে আর কি মশাই? আপনার নাম নেই এখানে। বিশ্বাস না হয় আপনিই দেখে নিন।’

পিওনের হাত থেকে প্রকাণ্ড রেজিস্টার খাতাটা নিয়ে সেদিনের তারিখের নীচে সব কটা লাইন তিন থেকে চার বার করে পড়ল সুব্রত। সত্যিই তো, ‘সুব্রত বোস’ বলে কোন ব্যাক্তির নামই সেখানে নেই।

অথচ গত বুধবার সে ডাকে এই পত্রিকার অফিস থেকে চিঠি পেয়েছে তার পড়াশুনার যাবতীয় কাগজপত্র সমেত ইন্টার্ভিউতে উপস্থিত থাকবার জন্য। এরকম কোন পরিস্থিতিতে পড়লে স্বাভাবিক ভাবেই যে কোন মানুষ যা ভেবে থাকেন, সেটাই সুব্রত ভাবল- অফিস কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকেই কোন গোলমাল হয়েছে।

‘দেখুন আমি গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছিলাম এখানে আসবার, আমার আজ ইন্টার্ভিউ আর এখন আপনারা দেখাচ্ছেন যে…’

‘এই আস্তে আস্তে, এক্ষুনি ওই ঘর থেকে বাবুরা এসে পড়বেন’, পিওন হাত তুলে বললেন।

‘আরেবাবা আমি…’

পিওন আবার হাত তুলে আস্তে কথা বলার ঈশারা করলেন। ভদ্রলোকের কিন্তু সত্যিই কোন সাহায্য করবার ইচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ উনি শুধু মজাটাই দেখছিলেন।

সুব্রত এবার একটু আস্তে বলতে লাগল, ‘আরে আমি আপনাকে বলছি তো, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আমি অ্যাপ্লাই করে চিঠি পেয়েছি ইন্টার্ভিউতে আসবার আজকে।

আমি কেন আপনাকে মিথ্যে বলতে যাব? আপনার এই রেজিস্টার বাদে সিস্টেম–এর রেকর্ড নেই?’

পিওন ঠাণ্ডা মাথায় এবার একটা উল্টো প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার ওই চিঠিটা আছে?’

‘এই তো’ কথাটা বলে সুব্রত তার ডান হাতের ফাইল থেকে কাগজটা বার করতে গেল। ফাইলে সুব্রত আজ সকালে তার পড়াশুনার সমস্ত দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। সব কাগজ কালানুসারে গুছিয়েছে সে, সেই মাধ্যমিক থেকে গ্রাজুয়েশন অবধি সব আছে সেখানে।

এবং আছে সেই চিঠিটি, যার কথা সে এতক্ষন ধরে বলে চলেছে। সেগুলো সব আছে সুব্রতর সেই সবুজ রঙের কভার ফাইলে। অন্তত সুব্রত তাই জানত।

‘একি!’ কথাটা ইন্টার্ভিউ রুমের বাইরে বসে থাকা আর সকলকে আকর্ষণ করেছিল। কথাটা সুব্রত বলল তার সেই হাতে ধরা ফাইল থেকে বেড়িয়ে আসা কাগজগুলো দেখে। কোনটা মোটা, কোনটা বেশ পাতলা, কোনটা একটু হলদে, কোনটা একটু নীলচে, আবার কোন কোন কাগজ ধব-ধবে সাদা।

ছুঁতে সেগুলো সত্যিকারের মানপত্রের মতই মনে হয়। কিন্তু প্রতিটি কাগজে একটাই জিনিস বাদ। সেগুলতে কোন কালি নেই। সেগুলতে কোন লেখা নেই। ফাঁকা সেগুলো, শুন্য। ঠিক সুব্রতর মুখের মতো, যেটা হাঁ করে চেয়ে আছে কাগজগুলোর দিকে। সেই কাগজগুলোর সাথে বেড়িয়ে পড়ল আরও একটি কাগজ। ছোট, ভাঁজ করা।

সেটা ওই পত্রিকার অফিসের চিঠি বলেই জানত সুব্রত। কিন্তু সেটারও ভাঁজ খুলতে দেখল সেই কাগজেও সেই একই অভাব। সেটাও সম্পূর্ণ ফাঁকা। এমনকি তাতে কোন লেখার ছাপও নেই। অথচ সুব্রত জানত যে সেই চিঠি তাকে টাইপরাইটারে লিখে পাঠানো হয়েছিল। প্রতিটি অক্ষরের ছাপ পাতার উল্টোদিকে সে অনুভব করেছিল তার আঙুল দিয়ে আজ সকালেও। কিন্তু এখন কিচ্ছু নেই। যেন কখনো কিছু ছিলই না।

পিওন ভদ্রলোক ঘটনাটা দেখে মনে মনে বেশ উপভোগ করেছিলেন। বাইরে শুধু মুচকি হাসলেন, বললেন না কিছু। সুব্রত সেই ফাঁকা কাগজগুল আবার তার ফাইলে পুরে বেড়িয়ে এল অফিস থেকে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার আওয়াজ তার অসহ্য লাগছে। কীভাবে এরকম হল? এতটা ভুলো মন তার? কোথায় রেখে এসেছে সেই কাগজগুলো সে? তার ঘরে? বিছানার উপর? খাবার টেবিলে? নাকি এখনো সেগুলো আলমারিতে বন্দি? তাহলে আজ সকালে কোন কাগজগুল নিল সে ফাইলে?

ঘণ্টা খানেক পর তার শুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির ছোট্ট ঘরটি লণ্ডভণ্ড করে ফেলল সুব্রত। সব দেখল সে। সব। কোথাও সেই মানপত্রগুলো নেই। নেই সেই ছাপা চিঠি। কোথাও নেই। মা তার শয্যা ছেঁড়ে ছেলের উন্মত্ত ব্যবহার দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি রে? কি হারালি? আর এত তারাতারি চলে এলি যে? হয়ে গেল ইন্টার্ভিউ?’

মেঝেতে বসেছিল সুব্রত মাথায় হাত দিয়ে। তার মাথা ধরে গেছে।

এর কোন অর্থ বুঝতে পারছে না সে। মাকে দেখে সে মার হাত ধরে তাকে আবার শুইয়ে দিয়ে এল মার ঘরে। বলতে লাগল, ‘কেন তুমি উঠে এলে বল তো? তোমার না রেস্ট নেওয়া দরকার?’ বৃদ্ধা মাও ভুলে গেল তাতে। আবার তার ঘরে ফিরে সুব্রত বসে পড়ল মেঝেতে। খোলা জানালার পাশে চেয়ারে ঠেশ দিয়ে রাখা ছবিটার দিকে চোখ চলে গেল তার।

উঠে গেল সে ছবিটার দিকে। ডান হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ক্যানভাসটা আলত করে ছুঁল। শুকিয়ে গেছে। অল্প হাসল সুব্রত। তার এই সঙ্কট-পূর্ণ সময়ে, যখন তার মানপত্র খুঁজে না পেলে তার অন্য সব চাকরির রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তখনও সুব্রতর গতকাল রাতে তার হাতে আঁকা ছবিটা দেখে হাসি পেল।

আবার সে অনুভব করল সেই গতকাল রাতের লোভ। মায়া নয়। আবার সে মনে মনে ভাবল, ‘ঈশ, এরকমটা কি আর হবে…?’

****

সুব্রতর এক বন্ধু ছিল। ইস্কুলের বন্ধু, অমিত। একই পাড়ায় বাড়ি তাদের। বাস্তব জগতের কঠিন সত্যিগুল যখন খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হত, তখন সুব্রত চলে যেত ওর বাড়ি। কথা বলত, গলা ছেঁড়ে গান করত দুজনে। অমিতের মা-বাবা কিছু মনে করতেন না। সুব্রতকে ওদের ভালোই লাগত। এই করে মনকে শান্তনা দিত সুব্রত। অমিত বিজ্ঞানের ছেলে। এখন ফিজিক্সে মাস্টার্স করছে প্রেসিডেন্সি থেকে। তবে তারো সুব্রতর মতো শিল্পের দিকে একটা ঝোঁক আছে। অবশ্য সেটা ঝোঁকের থেকে বেশি কিছু না।

সুব্রতর মতো প্রতিভা তার নেই। তবে সে ভালো কাজের কদর করতে পারে। রুচিবোধও আছে বেশ ভালোই। সুব্রতর এই দুর্দশায় অমিতই ওকে ওর আঁকাটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেয়। দুজনের বেশ একে-অপরের সাথে মেলে। তাই আজ মানপত্রের ঝামেলা থেকে একটু বিরতি নিয়ে সুব্রত ভাবল সে যাবে তার এই বন্ধুটির বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায়। পরে এসে আবার খুঁজে দেখবে সে। হয়তো মনটা একটু হাল্কা হলে সে খুঁজে বের করতে পারবে কাগজগুলো। কোথায় আর যাবে? ওইটুকু তো ঘর।

সুব্রতর বাড়ি থেকে দুটো বাড়ি পরে অমিতের বাড়ি। ওদের নিজেদের বাড়ি, সুব্রতদের মতো ফ্ল্যাটবাড়ি নয়, আর বেশ সুসজ্জিত। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার আর তারপর খুব তারাতারি পর পর দুবার বেল টিপল সুব্রত। ওটাই ওর 'সংকেত'। ওটা শুনলেই অমিত বুঝে যায় যে কে এসেছে, এবং কেন। মিনিটখানেক পর এক বছর চব্বিশ-পঁচিশের ছেলে বাড়ির ভিতর থেকে এগিয়ে এল গেটের দিকে। গেটের তালা খুলে সুব্রতকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

'তোর ঠাকুরদাকে চাই রে শুয়ার! ন্যাকামি হচ্ছে। নে চল, একটু বসব।' এইভাবে ঠাট্টা-গালিগালাজ সব বন্ধুদের মধ্যে হয়, সুব্রত-অমিতের মধ্যেও হত। অবশ্য বাড়িতে নয়, বাইরে। কিন্তু আজকের ঠাট্টাটা যে শুধুমাত্র ঠাট্টা নয়, সেটা সুব্রত বুঝতে পারেনি। তাই তার গালিগালাজটাকেও ঠাট্টা হিসেবে নিতে পারল না অমিত। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে, আজকালের সব ছেলে-মেয়েদের মতই ইংরাজিতে বলে উঠল সে, 'এই who the hell are you? What's your problem, coming to my house and cussing me?'

'এই ভাই, কীরে? কি হল তোর? আরে আমি তোর বন্ধু সুব্রত…কেন এরকমটা করছিস…?'

কিন্তু ইংরাজির চাবুক মারা বন্ধ হল না।

'Oh so now it's a joke is it? Cuss me first, and then play the fool, that your game?'

'এই ভাই come on… কি হয়েছে তোর? চল না, একটু গিয়ে বসি। কেন এরকম করছিস তুই?'

'আমি করছি? আমি? সালা, কোথাকার কোন ঠকবাজ, এখানে এসে… এই, বেরোও তো, অনেক হয়েছে, মানে মানে কেটে পড়। না হলে কিন্তু পুলিশ ডাকব বলে দিলাম।'

'তুই কি বলছিস এসব…?'

'GET OUT OF HERE!' গর্জে উঠল অমিত। আর সেই সাথে বিদ্যুদ্বেগে গেট বন্ধ হয়ে গেল সুব্রতর মুখের উপর। ফিরে গেল অমিত বাড়ির মধ্যে। মধ্যে থেকে গলার আওয়াজ শুনতে পেল সুব্রত। কাকিমা জিজ্ঞাসা করছে কে এসেছিল। অমিত বলল, 'কে জানে? কোথাকার কোন ছোটলোক…'

'ছোটলোক'? সুব্রত? এই কথাটা তাকে অমিত বলতে পারল? সেই অমিত, যাকে সে আজ প্রায় আঠারো বছর ধরে চেনে, যার সাথে সে বড় হয়েছে একই পাড়ায়, একই স্কুলে? সত্যিই কি তাকে অমিত চেনে না আর? সেই অমিত, যার সাত বছর বয়সে ইস্কুলে ফুটবল খেলতে গিয়ে বাঁ পা মচকে যাওয়ায় সুব্রত তার পাশে সর্বক্ষন ছিল? তাহলে গত শুক্রবার কার বাড়ি গিয়ে ঘণ্টা দেড়েক আড্ডা মেরে কার কাকিমার হাতে কড়াইশুঁটির কচুরি খেল সে? পুরোটাই মিথ্যে হয়ে গেল একটি সন্ধ্যায়? কথাগুলো ভাবতে সুব্রত সেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছিল আরও মিনিট দশেক। শেষে এই আশ্চর্য রকমের পরিহাসের কোন অর্থ বুঝতে না পেরে সে আবার তার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

আজকের দিনটা সত্যিই সুব্রতর কাছে আশ্চর্য একটি দিন। প্রথমে সকালের সেই ঘটনা, তারপর এখানে তার এত কাছের বন্ধুর কাছে অপমানিত হওয়া। এই পৃথিবীতে যারা আছে তাদের জীবনে ঘটা সব ঘটনার পিছনে একটা কারণ আছে বলে সুব্রত বিশ্বাস করত। সে বিশ্বাস করত যে তার বাপের অকাল প্রয়াণের পিছনেও একটা কারণ ছিল- সুব্রতকে তার আকাশকুসুম স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনা, যাতে করে সে সংসারের হালটা ধরতে সক্ষম হতে পারে। সেই ভেবেই সুব্রত আর কোন দিন দুঃখ করত না। কিন্তু আজ তার সাথে যে ঘটনাগুলো ঘটল, তার কিই বা কারণ থাকতে পারে? আদেও কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে? তাহলে, সুব্রতর এতদিনের গড়া বিশ্বাস কি ভুল? মিথ্যে?

পাড়ার এক কুকুর ছিল, সবাই ভুলু বলে ডাকত। কে সেই নাম দিয়েছিল, তা কেউ জানত না। সে মাঝে মাঝে চলে আসত সুব্রতর বাড়ির রাস্তায়, আর তাকে দেখলে ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে চলে আসত সুব্রতর কাছে, যদি কিছু খেতে পায়। সুব্রত সব সময় খেতে দিতে না পারলেও ভুলুকে আদর করত কাছে পেলে। ভুলু সুব্রতকে খুব পছন্দ করে ফেলেছিল। তাই এই কদিন ধরে রোজই সে সন্ধ্যা করে সুব্রতর বাড়ির উলটোদিকের একটা আলোর খুঁটির নীচে বসে থাকত, যাতে করে সুব্রতকে সে ফেরার সময় ধরতে পারে। আজও দেখল সুব্রত ভুলুকে। কিন্তু ভুলু সুব্রতকে যেন দেখেও দেখল না।

‘ভুলু, এই ভুল, আয়, আয়, ভুলু…’

কোন সাড়া নেই। খুঁটির নীচে বসে ভুলু কেমন যেন নির্জীব হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, অথচ তাকে না দেখে যেন তার পিছনের বাড়ির পাঁচিলটাকে দেখছে সে।

‘ভুলু, এই ভুলু,… আ- আ-…এই ভুলু’

না, কোন সাড়া নেই। ভুলু আসবে না। তার উঠে আসার কোন লক্ষণ দেখল না সুব্রত। হয়তো সে অসুস্থ, হয়তো আর সুব্রতর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা নেই তার। একবার ভাবল সে ভুলুর কাছে গিয়ে তাকে আদর করবে, কিন্তু তারপর ভাবল, হাজার হোক পশু তো, এখন মেজাজ ঠিক না থাকলে যা কিছু করতে পারে। না, ওকে একা ছাড়াই ভালো। কিনু তাও, বন্ধুর অপমানের পর ভুলুর এই পাত্তা না দেওয়াটা যেন সুব্রতর মন আরও খারাপ করে দিল।

****

তিন তলায় উঠে নিজের বাড়ির দরজার সামনে সুব্রত যখন এল তখন কেমন যেন মনে হচ্ছিল তার। তার বাড়ির দরজাটা কি এতটা পরিষ্কার, এতটা চকচকে ছিল? বেল টেপাতে, মধ্যে থেকে মার গলা সে শুনতে পেল-‘যাই…’ কিন্তু, এটা কীভাবে সম্ভব? তার মার গলায় এত আনন্দ, এত উৎফুল্লতা কোথা থেকে এল? বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে মার জীবনের সব রঙ চলে গিয়েছিল বলে জানত সুব্রত। অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল মা, মানসিক অবসাদে। আজ এই কণ্ঠস্বর তার মার তো ঠিকই, কিন্তু তাতে কোথায় সেই অবসাদ, কোথায় সেই শোক? যেন কিছুই হয়নি? যেন বাবা…

বাবা! হ্যাঁ, বাবাই তো! দরজাটা খুলে যে ব্যাক্তি বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, সে আর কেউ নয়, সুব্রতর স্বর্গীয় পিতা, সঞ্জয় বোস, যিনি বছর দুয়েক আগে চলে গিয়েছিলেন হৃদরোগে সুব্রত ও তার মাকে সম্পূর্ণ একা করে দিয়ে। আজ সেই বাবাকে দু চোখের এতটা কাছাকাছি দেখতে পেয়ে সুব্রতর সারাটা শরীর পাথরে পরিণত হল।

বাবা দেখল বাইরে কেউ আছে কিনা। তাঁর দৃষ্টি সুব্রতর উপরেও পড়ল, কিন্তু দেখতে পেল না সে সুব্রতকে, তাঁর নিজের সন্তানকে। বাবা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, ‘এ নিশ্চয় ওই উপরের সমানির ছেলেটার কাজ। ওটা দিন দিন একটা কীটে পরিণত হচ্ছে।’ ‘কীট’ কথাটা বাবা ব্যবহার করত কারোর উপর রাগ দেখানোর বেলা। কিন্তু বাবাকে যেন কেমন অন্য রকম

লাগছে আজ? কোথায় সেই হাড়ভাঙা খাটনির ক্লান্তি, সেই শীর্ণকায় চেহারা, সেই শুকিয়ে যাওয়া চোখ মুখ? যে মানুষটিকে সুব্রত আজ তার বাবা বলে চিনেছে, সে কি আদেও কোনদিন পরিচিত ছিল কেরানীগিরির সাথে?

বাবা এবার দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল। সেটা দেখে চট করে ঢুকে পড়ল সুব্রত ভিতরে। বাবা যেন টেরই পেল না। ঢুকে সুব্রতর মাথা ঘুরে গেল। সেই অগোছালো বাড়ি এত সাজানো-গোছানো কবে থেকে হল? নতুন সব সোফা, নতুন খাবার টেবিল চেয়ার, নতুন সব আলমারিতে বই ও কতরকম ঘর সাজানর সব সরঞ্জাম। কার বাড়ি এটা? কোন বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সে?

রান্নাঘর থেকে এবার একটা চেনা পরিচিত গন্ধ বেরুতে শুরু করেছে। এটা সুব্রতর খুবই চেনা। তার মার হাতে তৈরি লুচি-তরকারির গন্ধ। মা করত সুব্রতর জন্য। আজ থেকে অনেক দিন আগে। তার বাবারও খুব পছন্দ ছিল। আজও মা বানাচ্ছে। বাবা বলে উঠল, 'আহ, ওগো, বলছি যে আর তো থাকা যাচ্ছেনা। আর কত দেরী?'

রান্নাঘর থেকে একটা হাসির শব্দ এল ভেসে। তার মার গলায় হাসির শব্দ। যে হাসি সুব্রত আজ বহু বছর হল শোনেনি। বাবা সোফায় বসে লুচি-তরকারির অপেক্ষায় অন্যমনস্কভাবে পত্রিকা ওলটাতে লাগল। তাঁর মুখের সেই তৃপ্তি ভরা হাসি দেখে সুব্রতও হাসল একটু। না, কোন দুঃখ তো নেই তাঁর। ভালোই তো আছেন বাবা। আর মা?

রান্নাঘরে গিয়ে যে মানুষটিকে সুব্রত দেখল, তিনি তার মা ঠিকই, কিন্তু সেই মানুষটিকেও সুব্রত দেখেছিল অনেক, অনেক বছর আগে, তার ছোটবেলায়। তিনি খুশি, সুখি। কি আনন্দের সাথে বানাচ্ছেন তিনি তাঁর স্বামীর জন্য তাঁর প্রিয় খাবার। কোথাও তো দুঃখ নেই। কোথাও নেই। যেন কখনো ছিলই না। যেন কক্ষনো, কোন দিন...

কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল সুব্রতর। সে বেড়িয়ে এল রান্নাঘর থেকে। বসার ঘরের চারিদিক দেখে সে বুঝল তার অনুমানই ঠিক। রান্নাঘরের পাশে ছিল বাবা-মার ঘর, আর তার পাশেই ছিল সুব্রতর ঘর। ছিল। আর নেই। যেন কখনো ছিলই না। যেন কক্ষনো, কোন দিন...

হাসি পেল আবার সুব্রতর। আবার সে চারিদিক দেখল। ভালো করে দেখল সে সেই ফ্ল্যাটবাড়িটিকে আবার। না, কোথাও কোন চিহ্ন নেই তার। ফ্রিজের পিছন থেকে উকি মারা তার ছেঁড়া কালো ঘুড়িটা, বুকশেলফের পাশে ঠেশ দিয়ে দাড় করানো তার ক্রিকেট ব্যাট, এমনকি সেই বুকশেলফের উপরে রাখা পুরিতে বেড়াতে গিয়ে তোলা তাদের ফ্যামিলি ফটোতেও নেই সুব্রত। যেন সে কখনো ছিলই না। যেন কক্ষনো, কোন দিন...

মা বেড়িয়ে এল রান্নাঘর থেকে। হাতে একটা প্লেটে করে অনেক কটা লুচি আর পাশে বেশ কিছুটা ছোলার তরকারী। বেড়িয়ে এসে তার দৃষ্টি চলে গেল ঠিক সুব্রতর দিকে।

'ওকি!'

বাবা একটু চমকে উঠলেন।

'কি হল?'

'ওটা আবার কি?'

'কোনটা?'

‘ওই যে, ওই সোফাটায় রাখা? ওটা কি?’

বাবা সেই সোফা থেকে তুলে নিল জিনিসটা। খয়রি কাগজে মোরা একটা চৌক আকারের চ্যাপটা জিনিস। কাগজের মোড়ক খুলতে খুলতে বাবা বলল, ‘এটা আজ কাজ থেকে ফেরার সময় বিমলের দোকানে পেলাম। জিনিসটা যে কেন এত ভালো লেগে গেল, কে জানে। তুমি তো জানই যে আমার আবার আর্ট অবজেক্টের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে, কিন্তু এটা দেখে আজ আর লোভ সামলাতেই পারলাম না, কিনে নিলাম। ছবিটা দেখে কেমন যেন করে উঠল বুকের ভিতর। দেখ, তোমারও ভালো লাগবে।’

কাগজের মোড়ক খোলা হল। যে ছবিটা মোড়কের ভিতর থেকে বেরুল, সেটা সুব্রত গত রাতে এঁকেছিল। তার ওই ছোট্ট ঘরে বসে, কোথাও একটা। সেই ছবি দেখেই লেগেছিল সুব্রতর খুব লোভ। ছবিটি আর কিছুই নয়, সুব্রতর আত্মপ্রতিক্রিতি। কিন্তু এই ছবির সুব্রতর সাথে বাস্তবের যে সুব্রত ছিল, তার অনেক ফারাক। ছবিতে সুব্রতর মুখে যে হাসি, যে আনন্দ, যে অপূর্ব সুখ প্রকাশ পেয়েছে, সেটা কখনো প্রকাশ পায়নি আসল সুব্রতর মুখে। অথচ সেই সুখই চেয়েছিল সুব্রত। তার লোভ হয়েছিল। সেই সুখের জন্য, যা একমাত্র তার মুখে প্রকাশ পায় যে জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব জায়গায় সাফল্য লাভ করেছে সবসময়। যাকে কখনো ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয় কোনদিন। দেখতে হয়নি অভাবের মুখ। যে জীবনে খালি উঠেছে, নামেনি কোনদিন। সেরকম একটি মানুষকে সুব্রত তার চেহারা দিয়ে বানিয়েছিল ওই ছবিটি। এবং চেয়েছিল ছবির সেই মানুষটা হতে। চেয়েছিল সেই ছবিতে থাকতে। সেই অবিনশ্বর জগতে থাকতে, যার কোন অন্ত নেই, যার কোন পরিবর্তন নেই। যা অমর।

কীভাবে জানি প্রকৃতি শুনতে পেয়েছিল সুব্রতর সে ইচ্ছার কথা। তাই হয়তো প্রকৃতি আবার নিজেকে সেই রাতের পর থেকে নতুন করে সাজাতে শুরু করল। একটা নতুন জগত তৈরি করতে লাগল, যেখানে সুব্রত বোস বলে কেউ কখনো ছিলই না। যেন কক্ষনো, কোন দিন…

‘সুন্দর না ছবিটা?’

‘হ্যাঁ, আরও একটা জমল বাড়িতে। নাও, প্লেটটা ধরো।’

‘হ্যাঁ দাও।’

‘বাবা’ খেতে শুরু করলেন। ‘মা’ ছবিটা হাতে নিতে সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বললেন, ‘তা এত করে যে নিয়ে এলে, কার আঁকা কিছু জানো কি?’

চিবোতে চিবোতে ‘বাবা’ বললেন, ‘উঁহু, বিমল কিছু বলতে পারল না। জানে না। ছবিতে তো কোন সইও নেই, দেখ। যা হোক, ছবিটা তো খাঁটি জিনিস, কি বল? আর আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কীভাবে এরকম একটা জিনিস?’

‘হ্যাঁ, তাই বটে…’